রবীন্দ্রনাথ

আজকের সমাজে ও সময়ে

সংকলন ও সম্পাদনা
সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২০১৬

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে কথিত রবীন্দ্র মন্তব্য: একালে তার প্রাসঙ্গিকতা বিচার

মোহিনীমোহন সরদার

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচয়িতা মুকুন্দ চক্রবর্তী এমন একজন কবি যিনি পুঁথি[১] পত্রের যুগ থেকেই নিন্দিত এবং বন্দিত হয়েছেন বারবার। ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে পুঁথিপত্রের যুগেই রামানন্দ যতি মুকুন্দ কবিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে লিখেছিলেন-

চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কি তা জ্যায় লেখা
পাঁচালির অমনি রচন।
বুদ্ধি নাই যার ঘটে তারা বলে সত্য বটে
পথে চণ্ডী দিলা দরশন।।[২]

আবার ঐ পুঁথিপত্রের যুগেই ভারতচন্দ্র মুকুন্দ কবিকে সম্মান জানিয়েছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্যকে স্বীকার করে ভাঁড়ুদত্তের বংশধর ঝড়ুদত্তকে নিজের কাব্যে স্থান দিয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন-

আমলইড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ুদত্ত।
তার বংশে ঝড়ুদত্ত ঠক মহামত্ত।।

ধুমী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া।

তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিল গিয়া।।"[৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাতের দশক থেকে শুরু হয়েছে ছাপার অক্ষরে[৪] মুকুন্দের প্রশংসা আর নিন্দার ধারা। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড তাঁর 'A Grammar of the Bengal language' গ্রন্থে ব্যাকরণের উদাহরণ দিতে গিয়েই প্রথম ছাপার অক্ষরে[৫] যেমন মুকুন্দকে তুলে ধরলেন, তেমন আবার তিনি ওই গ্রন্থেই মুকুন্দের রচনা দক্ষতারও প্রশংসা করলেন। তত পরবর্তীকালে যতদিন গেছে, ততই বেড়েছে মুকুন্দের প্রশংসা আর নিন্দার ধারা। ১৮৭১ এবং ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে Calcutta Review পত্রিকায় 'Bengali literature'[৬] এবং বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'বাঙ্গালা ভাষা'[৭] নামের প্রবন্ধ দুটিতে মুকুন্দ চক্রবর্তীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অতঃপর মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়[৮], রামগতি ন্যায়রত্ন[৯], রমেশচন্দ্র দত্ত[১০], রাজনারায়ণ বসু[১১], অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী[১২], গঙ্গাচরণ সরকার[১৩] প্রমুখ বঙ্কিম গোষ্ঠীর লেখকগণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রদর্শিত পথ[১৪] অনুসরণ করে যখন মুকুন্দ চক্রবর্তী ও তাঁর রচিত কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তখন রবীন্দ্রনাথ গোষ্ঠী প্রশংসার বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে শুরু করলেন। তিনি তখন সদ্য ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরেছেন[১৫]। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের আলোকে আলোকিত কবি[১৬] ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন 'বাঙ্গালী কবি নয়'[১৭] প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ একদিকে কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নীরব কবির তত্ত্ব'[১৮] এবং অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালী কবি কেন'[১৯] প্রবন্ধ দুটির বক্তব্যকে অস্বীকার করে উক্ত দুই প্রাবন্ধিককে তীব্র ভাষায় আক্রমণ[২০] করলেন আর তাঁর বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে উদাহরণ হিসাবে তিনি তুললেন মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদাহরণকে[২১]। তাঁর বক্তব্যে ফুটে ওঠে মুকুন্দ কবির 'কল্পনা' ও 'পরিমাণ সামঞ্জস্যের অভাব'। আমরা আগেই স্বীকার করেছি দীর্ঘ এই প্রবন্ধটি মুকুন্দ বিরোধিতার জন্য নয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের আলোকে বাংলা কাব্য ব্যাখা করতে গিয়েই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাতে মুকুন্দ ভক্তগণ কবিকে তীব্র আক্রমণ করতেই রবীন্দ্রনাথ সেই আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করলেন। তাঁর একাধিক প্রবন্ধে মুকুন্দ কাব্য প্রসঙ্গের উল্লেখ করে পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের বিচারে সমকালীন মুকুন্দ ভক্তদের[২২] বিরোধিতা করলেন।

ঠিক এরকমই একটি সময়ে ১২৮১ (১৮৭৪) বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ মাস থেকে সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বরদাকান্ত মিত্রের সম্পাদনায় 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' এর বিভিন্ন খণ্ড ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে। এই সংগেহের প্রথম খণ্ডে 'বিদ্যাপতি', দ্বিতীয় খণ্ডে 'চণ্ডীদাস', তৃতীয় খণ্ডে 'গোবিন্দদাস', চতুর্থ খণ্ডে 'রামেশ্বরের সত্যনারায়ণের পাঁচালী' এবং পঞ্চম খণ্ডে 'মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৮১ বঙ্গাব্দের 'সাধারণী' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপণ দিয়েছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও তাঁর সহযোগীরা। সেখানে বলা হয়েছিল-

> প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ (মাসিক)। / আমরা বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্য অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিক সংখ্যায় প্রকাশ করিতেছি। পাঠ যতদূর পরিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা হইবে। যত্নের ত্রুটি হইবে না এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহ পদের অর্থ দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক কবির এক একটা সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত, কাব্যের গুণ বিচার ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইবে। চুচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। ...প্রতিখণ্ডের মূল্য চারি আনা মাত্র।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও তাঁর সহযোগীদের সম্পাদিত এই গ্রন্থগুলির গ্রাহক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'জীবনস্মৃতি'র 'ঘরেরপড়া' অংশটি থেকে আমরা জানতে পারি এই খণ্ডগুলি রবীন্দ্রনাথের 'লোভের সামগ্রী' ছিল। তিনি গভীর আগ্রহে অদম্য উৎসাহে গ্রন্থগুলি পাঠ করতেন। সম্পাদকত্রয় গ্রন্থগুলির 'পরিশুদ্ধ পাঠ' যত্ন সহকারে নির্ণয়ের চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহ পদের অর্থ করে দেওয়া হবে বলে পাঠকের কাছে উপরিউক্ত বিজ্ঞাপনে যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন তা তাঁরা রক্ষা করতে পারেননি বলে রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করলেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিযোগ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনাও করলেন। তাঁর বক্তব্য -

> সম্পাদক শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার যথাসাধ্য যে কথার যে রূপ অর্থ করিয়াছেন, যে শ্লোকের যে রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পাঠকেরা কি একবার মনোযোগ করিয়া দেখিবেন না, যে তাহা ব্যাকরণ শুদ্ধ হইল কি না, সুকল্পনা সংগত হইল কি না? সে বিষয়ে কি একেবারে মতভেদ হইতেই পারে না? ...বঙ্গভাষা যাঁহাদের নিকট নিজের অস্তিত্বের জন্য ঋণী, এমন সকল পূজনীয় প্রাচীন কবিদিগের কবিতা সকলের প্রতি যে-সে যে রূপ ব্যবহার করুক না আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া চাহিয়া থাকিব? ...যিনি এই সকল কবিতার সম্পাদকতা করিতে চান তিনি নিজের স্কন্ধে একটি গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রতিপদে সাধারণের নিকটে হিসাব দিবার জন্য তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন।

...কবিদিগের কাব্য যিনি সংগ্রহ করেন, তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে যদি অসাবধনতা, অবহেলা, অমনোযোগ লক্ষিত হয়, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে আমরা গুরুতর তিনটি নালিশ আনতে পারি- প্রথমত কবিদের প্রতি তিনি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, দ্বিতীয়ত: সাহিত্যের সহিত তিনি যে চুক্তি করিয়াছিলেন, সে চুক্তি রীতিমতো পালন করেন নাই; তৃতীয়ত, পাঠক সাধারণকে তিনি অপমান করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, অথচ যথাযোগ্য আয়োজন করেন নাই। ...অক্ষরের ভুল হইল হইলই, তাহাতে এমনি কি আসে যায়? অর্থ বোধ হইতেছে না? একটা আন্দাজ করিয়া দেও না, কে অনুসন্ধান করিয়া দেখে? পাঠকের প্রতি এরূপ ব্যবহার কি সাহিত্য আচারের বিরুদ্ধ নহে?[২৩]

এরপরের ইতিহাস সাহিত্য রসিকের অজানা থাকার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাপতির পদ তুলে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ব্যাখ্যার পাশাপাশি নিজের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে সম্পাদকের সম্পাদনা কর্মের ফাঁকগুলি দেখিয়েছেন। বিদ্যাপতির পদের শব্দার্থ ধরে ধরে রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা শুধু সেকালেই নয়, একালেও তা নতুন পথের সন্ধান দেয়। মূলতঃ এই কারণেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। উক্ত পদাবলী সম্পাদনার ইচ্ছা থাকলেও সময়ভাবে এবং তাঁর টীকা-টিপন্নী লেখা 'খাতার অভাবে'[২৪] রবীন্দ্রনাথ তা করে উঠতে পারেননি বলেই জানা যায়।

বঙ্কিম গোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রনাথের যখন এইরূপ বাদানুবাদ মসীযুদ্ধের পরিণতি পাচ্ছে ঠিক তখনই অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের পঞ্চম খণ্ড কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থটি তাঁর হাতে আসে। এই গ্রন্থটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির মার্জিনে বহু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন। রবীন্দ্র মন্তব্যে রঞ্জিত সেই গ্রন্থটি[২৫] একদা বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল, গ্রন্থটির কল নম্বর ছিলো- '৮১.৩৭৭ মু'। উক্ত কার্ড ইনডেক্স থেকে গ্রন্থটির যে বিবরণ পাওয়া যায় তা এইরূপ- "মুকুন্দরাম চক্রবর্তী/ কবিকঙ্কণ চণ্ডী/ অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত/ চুঁচুড়া/ ১২৮৫/ ৮০০ পৃ."।

গ্রন্থটি পাঠ করার অব্যবহিত পরে প্রথম বর্ষ 'হিতবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উপর একটি আলোচনা লিখেছিলেন, যে লেখাটির কথা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল বোধনী' গ্রন্থের

দ্বিতীয় খণ্ডে স্বীকার করেছিলেন। এই লেখাটি উদ্ধার হলে কবিকঙ্কণ চণ্ডী সর্ম্পকে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব প্রথম দিকে কেমন ছিল, তা স্পষ্ট হতো বলেই আমাদের বিশ্বাস। সে যাই হোক গ্রন্থটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী' দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির (সংখ্যা- ২৪৬) শেষের ছয়টি পৃষ্ঠায় 'সন্দেহ স্থল' শিরোনামে উক্ত গ্রন্থের ২২৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শব্দার্থের আলোচনা ও তাঁর সন্দেহের কথা জানিয়েছেন। এ নিয়ে গবেষকগণ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই শব্দার্থ এবং তাঁর সন্দেহের আলোচনাগুলির কিছু অংশ এইরূপ-

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' গ্রন্থের 'গণেশ বন্দনা' অংশে আছে-

অঙ্গের বন্ধূক ছটা আজানু লম্বিত জটা

শশিকলা মুকুট মণ্ডল।

উক্ত পাঠের 'আজানু লম্বিত জটা' নিম্নরেখাঙ্কিত করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থ পৃষ্ঠার মার্জিনে লিখেছেন-'গণেশের জটা আছে কি?'

ঐ একই বর্ণনার শেষের দিকে আছে-

"কুঙ্কুম চর্চিত অঙ্গ শূণ্ডে শোভে মাতুলুঙ্গ

শূনদন্ত ইষু পাশ করে।"

'মাতুলঙ্গ' শব্দটিকে নিম্নরেখাঙ্কিত করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন- 'অর্থ কি?' এবং তারপর নিজেই অর্থ করেছেন- 'মাতুলঙ্গ বৃক্ষ বিশেষ। মুদ্রিত পুস্তক সকলে মাতু অঙ্গ আছে। আমাদিগের পুঁথিতে মাতুলঙ্গ আছে, কোনওটিই সুসংগত বোধ হয় না।'

উক্ত গ্রন্থের 'চণ্ডী বন্দনা'য় আছে-

করি অরি জিনি মধ্যমাজাক্ষীণী কটিতে কিঙ্কিণী বাজে।

জিনি করি কর জখন সুন্দর নিতম্বে বসনা সাজে।।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে কথিত রবীন্দ্র মন্তব্য: একালে তার ...

নাভি সরোবর তথির উপর তনুরুহ অঙ্কুর দাম।

উচ্চ কুচগিরি জিনি কুম্ভকরী করী করে জলপান।।'

উপরিউক্ত চরণগুলির দ্বিতীয় চরণটিকে নিম্নরেখাঙ্কিত করে রবীন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছেন- 'কিরূপ উপমা?' এবং চতুর্থ চরণটিকে নিম্নরেখাঙ্কিত করে তিনি লিখেছেন- 'অর্থ কি?'।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' গ্রন্থের 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশে আছে-

সরকার হইলা কাল খিলভূমি লেখে লাল

বিনা উপকারে খায় ধুতি।

পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম

পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।।

ডিহিদার অবোধ খোঁজ কড়ি দিলে নাহি রোজ

ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।...

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন- 'সমস্তটার অর্থ কি? ধুতি অর্থে ঘুষ স্থানে স্থানে অনুমান হয়।'

আবার ওই একই বর্ণনার শেষের দিকে আছে-

হাতে লইয়া পত্র মসী আপনি কলমে বসি

নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থ মার্জিনে লিখেছেন - 'আপনি শব্দের Root কি?'

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত গ্রন্থের 'ফুল্লরার বারমাস্যা' অংশে আছে-

তৈল তুল তনূনপৎ তাম্বুল তপন।

করয়ে সকল লোকে শীত নীবারণ।।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- 'তাম্বুল কি করে শীত নিবারণ করে?'

মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাঠ করে পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় বলা তাঁর এইরূপ জিজ্ঞাসা পরবর্তীকালেও বজায় ছিল। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পাওয়া বঙ্গবাণী সংস্করণে[২৬] তার প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথের এই জিজ্ঞাসু মনোভাব শুধু সেকালে নয়, একালেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

এর কয়েক বছর পর অর্থাৎ ১২৯৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'নবজীবন'পত্রিকায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'কাব্যি সমালোচনা' নামক প্রবন্ধে মুকুন্দের প্রশংসা করে লিখলেন-

"কবিকঙ্কণের দারিদ্র্য দুঃখ বর্ণনা- যে কখন দুঃখের মুখ দেখে নাই, তাহাকেও দীনহীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়।

দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।

আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।।

দু-বেলা দু-সন্ধ্যে অন্ন জুটে না- কোন দিন ভাত খাই, কোন দিন বা আমানি খাইয়া কাটাই। খাবার ত কোনও পাত্র নাই, ভাত পাতে খাওয়া যায়, আমানি ত পাতে খাওয়া যায় না, হাঁড়িতেও খাইতে নাই, মেঝেয় গর্ত করিয়া রাখিয়াছি, তাহাতেই ঢালিয়া আমানি খাই।

যে আমানি খাইয়া মধ্যে মধ্যে দিন কাটায়, সে অত কথা বলিবে কেন? সে বলিল, আমাদের দুঃখ বুঝিবে ত ঐ আমানি খাবার গর্ত দেখ।

"দারিদ্র্যের কি কঠোর অভিব্যক্তি। কথা কয়টা বুকের ভিতর বসিয়া যায়। ভাঙ্গা খাবার গর্ত কয়টা বিলাসীগণের জটে ধরিয়া, তাহাদিগকে নাড়া দিতে থাকে। আবার বলি ইহাই সার্থক কবিত্ব; সার্থক কল্পনা, সার্থক প্রতিভা।[২৭]

একদিকে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, গঙ্গাচরণ সরকারদের ভূয়সী মুকুন্দ প্রশংসা ও মুকুন্দ পূজা অন্যদিকে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'বিলাসীগণের জটে ধরিয়া তাহাদিগকে নাড়া দিতে থাকে'র মতো উদ্দেশ্য প্রণোদিত মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ ১২৯৩ বঙ্গাব্দে চৈত্র সংখ্যা 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় লিখলেন- 'কাব্য: স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ জানালেন -

আমানি খাবার গর্ত দেখাইয়া দারিদ্র্য সপ্রমাণ করার মধ্যে কতকটা নাট্য নৈপুণ্য থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে কাব্যরস কোথায়? দুটো ছত্র, কবিত্বে সিক্ত হইয়া

উঠে নাই, ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নাই। ইহাই যদি সার্থক কবিত্ব হয় তবে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে', সে তো আরো কবিত্ব।[২৮]

চণ্ডীঙ্গল কাব্যে মুকুন্দের কবিত্ব ও বাস্তবতা সর্ম্পকে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত পরবর্তীকালেও বজায় ছিল। বারমাস্যায় কালকেতুর পারিবারিক দারিদ্র্য বর্ণনা আসলে যে ফুল্লরার বানানো অতিশয়োক্তি সেকালের মুকুন্দ ভক্তরা তা সেদিন বুঝতে পারেন নি। অথচ ঐ বয়সেই রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে সেই সত্য ধরা পড়েছিল।

এরপর, যতদিন গেছে ততই মুকুন্দ চক্রবর্তী ও তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সর্ম্পকে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা আরও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। 'বাঙ্গালী কবি নয়' প্রবন্ধ (ভারতী, ভাদ্র-১২৮৫) থেকে শুরু করে সাহিত্যের মূল্য (১৩৪৮) পর্যন্ত দীর্ঘ তেষট্টি বছর ধরে তিনি মোট ৩৪টি স্থানে চণ্ডীমঙ্গল প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, একালেও আমরা তাঁর সেই বক্তব্যকে অস্বীকার করতে পারি না। মনে রাখা দরকার যে উনিশ শতকের ওই সময়টি ছিল মুকুন্দ পূজার কাল। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রমেশচন্দ্র দত্ত ও দুই অক্ষয়চন্দ্র সকলেই মুকুন্দের এতটাই অন্ধ ভক্ত যে, সমকালীন মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রমুখ আধুনিক কবিদের উপরেও তাঁরা মুকুন্দ চক্রবর্তীকে স্থান করে দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। এই অন্ধ মুকুন্দ প্রশস্তির বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ কবিকঙ্কণ চণ্ডীর তীব্র সমালোচনা করলেন 'বাঙ্গালী কবি নয়' প্রবন্ধে। বাঙালির কবিত্ব প্রতিভার দুর্বলতা দেখাতে গিয়ে তিনি কবিকঙ্কণের 'কমলেকামিনী' প্রসঙ্গে মুকুন্দের 'সৌন্দর্য কল্পনার অভাব ও অসামঞ্জস্য' এর কথা বললেন এবং সমগ্র কবিতাটির দীর্ঘ সমালোচনা করে লিখলেন- "কবিকঙ্কণের কাব্য অতি সরল কাব্য। কিন্তু উহা লইয়া আমরা বাঙ্গালী জাতিকে কবি জাতি বলিতে পারি না।"

এই সমালোচনায় ভারতচন্দ্রের সঙ্গে মুকুন্দ প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন -

কবিকঙ্কণের দেব-দেবীরাও নিতান্ত মানুষ। কেবলমাত্র মানুষ নহে, কবিকঙ্কণের সময়কার বাঙ্গালী। হর গৌরীর বিবাহ, মেনকার খেদ, নারীগণের পতিনিন্দা, হর গৌরীর কলহ পড়িয়া দেখ দেখি। কবিকঙ্কণ মহাকাব্য নহে। আয়তনে বৃহৎ হইলেই[২৯]

কিছু তাহাকে মহাকাব্য বলা যায় না।ভারতচন্দ্রের কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। তাহার মালিনী মাসী, তাহার বিদ্যা, তাহার সুন্দর, তাহার রাজা ও কোটালকে মহাকাব্যের বা প্রথম শ্রেণীর কাব্যের পাত্র বলিয়া কাহারো ভ্রম হইবে না। বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া কাহারো মনে কখনো মদানভাব বা যথার্থ সুন্দর ভাবের উদয় হয় নাই। কিন্তু এই গ্রন্থটি বাঙ্গালী পাঠকদের রুচির এমন উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে, যে বঙ্গীয় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার ইহা অতি উপাদেয় হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর যতলোকে পড়িয়াছে, তত লোকে কি শ্রেষ্ঠতর কাব্য কবিকঙ্কণ-চণ্ডী পড়িয়াছে। [৩০]

রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্র অপেক্ষা মুকুন্দ প্রতিভাকে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ট বলেছেন। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত একালেও সমানভাবে স্বীকৃত। তবে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মধ্যে মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্য খুঁজতে গিয়ে তার যে বিরূপ সমালোচনা তিনি করলেন, সেই সমালোচনার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়ে গেল মুকুন্দের বাঙালিয়ানা, কথা সাহিত্যিক সুলভ তাঁর নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তি, তাঁর সরস কৌতুক প্রবণতা, এককথায় মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ট কবি হতে পারার সপ্রশংস গুণগুলি।তরুণ রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করার উগ্র ঝাঁঝে বুঝতেই পারলেন না যে আসলে মুকুন্দের গুণগুলিই তিনি আবিষ্কার করে দিলেন।লিখলেন-

কবিকঙ্কণ চণ্ডী অতি সরল কাব্য সন্দেহ নাই। বাঙালীরাও এ কাব্য লইয়া গর্ব্ব করিতে পারে। কিন্তু ইহা এমন কাব্য নহে, যাহা লইয়া সমস্ত পৃথিবী গর্ব্ব করিতে পারে; অত আশায় কাজ কি, সমস্ত ভারতবর্ষ গর্ব্ব করিতে পারে। তখনকার বঙ্গবাসীর গৃহ অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণের কল্পনা তখনকার হাটে, ঘাটে, মাঠে, জমিদারের কাছারিতে, চাষার ভাঙ্গা কুঁড়েতে, মধ্যবিত্ত লোকের অন্তঃপুরে যথেষ্ট বিচরণ করিয়াছে। কোথায় ব্যাধের মেয়ে-

মাংস বেচি লয় কড়ি   চাল লয় ডালি বড়ি

শাক বাইগুণ কিনয়ে বেসাতি।

কোথায় চাষার "ভাঙ্গা কুড়িয়া তালপাতার ছাউনি" আছে, যেখানে অল্প "বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় ভাসিয়া যায় বাণ" কোথায় গাঁয়ের মণ্ডল ভাঁড়ুদত্ত হাটে আসিয়াছে-

পসারী পসার লুকায় ভাঁড়ুর তরাসে।

পসার লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি।

যতদ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি।।

তাহা সমস্ত তিনি ভাল করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু এই হাট মাঠই কি কল্পনার বিচরণের পক্ষে যথেষ্ট? কল্পনার ইহা অপেক্ষা উপযুক্ততর ক্রীড়াস্থল আছে।[৩১]

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বুঝি মুকুন্দ বিরোধী ছিলেন। সেকথা জোরের সঙ্গে কোনও কোনও সমালোচক বলেওছেন। কিন্তু তিনি যে কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাব্যের একজন নিরপেক্ষ সমালোচক ছিলেন তাও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কোনও কোনও সমালোচক। আর রবীন্দ্রনাথ যদি মুকুন্দ বিরোধী হন, তাহলে অর্ধশতাধিক কাল ধরে সে কবিকে বার বার স্মরণ করে নিজের লেখায় টেনে আনবেন কেন? চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত চরিত্রগুলির যথাযথ সমালোচনা তাঁর কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের সাধনা, পত্রিকায় 'নরনারী' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন-

> কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বৃহৎ সমভূমির মধ্যে কোথায় ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থানুমাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোনো কাজের নহে।[৩২]

কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যে সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা সমাজতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটটি রবীন্দ্রনাথের প্রধান বিচার্য হয়েছিল দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (২য় সংস্করণ) গ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩০৯) প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধে তিনি দেখলেন এক 'আধ্যাত্মিক অরাজকতা'র মধ্যে খামখেয়ালি 'মেয়েদেবতা' চণ্ডীর শক্তির লীলা। পরাজিত হয় 'শিবশক্তি'। পরবর্তীকালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩২৬) 'বাতায়নিকের পত্র' এবং 'শক্তিপূজা' (কার্ত্তিক ১৩২৬) আর্ন্তজাতিক রাজনীতির আলোচনা করতে য়ুরোপে শক্তির মদমত্ততাকে তুলনা করলেন 'চণ্ডীর' খামখেয়ালী শক্তির লীলার সঙ্গে। কবিকঙ্কণ চণ্ডী থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্টা করলেন তিনি।

অপরপক্ষে বার বার মুকুন্দ প্রতিভার প্রশংসা করলেন রবীন্দ্রনাথ ভাঁড়ুদত্ত চরিত্র সৃষ্টির চূড়ান্ত শৈল্পিক দক্ষতার কারণে। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' (বৈশাখ-১৩১৪) প্রবন্ধে লিখলেন-

> "কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্তের যে বর্ণনা আছে, সে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড়ো দিক দেখানো হইয়াছে তাহা নহে; এই রকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লি করিতে মজবুত লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাহাদের সঙ্গ যে সুখকর তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্তিমান করিতে পারিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাষায় এমন

একটা কৌতুক রস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদের হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত প্রত্যক্ষ সংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না। আমাদের মনের কাছে সুসহ করিবার পক্ষে ভাঁড়ুদত্তের যতটুকু আবশ্যক, কবি তাহার চেয়ে বেশি কিছু দেন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংসারে ভাঁড়ুদত্ত ঠিক ওইটুকু মাত্র নয়- এই জন্যই সে আমাদের কাছে অমন করিয়া গোচর হইবার অবকাশ পায় না। কোনো একটা সমগ্রভাবে সে আমাদের কাছে গোচর হয় না বলিয়াই আমরা তাহাতে আনন্দ পাই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বহন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে। [৩৩]

আমরা যদি মুকুন্দের কাব্যের অন্যান্য সমালোচনার কথা বাদও দিই এই একটি মাত্র চরিত্রের সৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন কবি। প্রয়াণের কয়েকমাস পূর্বেও এই চরিত্রটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চূড়ান্ত মত জানিয়েছেন প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাহিত্যের মূল্য' (জৈষ্ঠ- ১৩৪৮) প্রবন্ধে। তাঁর বক্তব্য:- "কবিকঙ্কণের সমস্ত কাব্যরাশি কালে কালে অনাদৃত হতে পারে, কিন্তু রইল তাঁর ভাঁড়ুদত্ত।"

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য:

১। 'পুথি' শব্দটি সংস্কৃত 'পুস্তক' শব্দটি থেকে এসেছে। শব্দটির বিবর্তনে আনুনাসিকতা নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে তা মানতেন না। তিনি 'পুথি' শব্দটিতে আনুনাসিকতা দিতে চেয়েছেন। তাঁর মতটিই এখানে গ্রহণ করে আমরা পুথি শব্দটিতে আনুনাসিকতা যোগ করেছি।

২। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. রামানন্দ যতি লিখিত চণ্ডীমঙ্গল – অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।

৩। দ্র. ভারতচন্দ্র রচিত – অন্নদামঙ্গল, বসুন্ধরার জন্ম।

৪। ড. বিজিতকুমার দত্ত জানিয়েছেন – কাব্যটি ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে বটতলা প্রথম মুদ্রিত করে। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, বসুমতী সংস্করণ, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পরিচিত অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৩) কিন্তু সুকুমার সেন জানান – "কবিকঙ্কণের কাব্য বহুবার ছাপা হইয়াছে। প্রথম ছাপা হইয়াছিল ১২৩০ সালে অর্থাৎ- ১৮২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দে"; (দ্র. সুকুমার সেন সম্পাদিত কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি ২০০১, ভূমিকা-পৃষ্ঠা-১২-১৩) যদিও এরও আগে ব্যাকরণের উদাহরণ হিসাবে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দেই মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল প্রথম ছাপাখানায় আসে।

৫। দ্র. Nathaniel Brassey Halhad: A Grammar of the Bengal language, Unabridged facsimile edition, Ananda Publishers Private limited, Cal-

cutta- 1980.

৬। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: - Calcutta Review, vol- 104, PP- 294-316.

৭। দ্র. বঙ্গদর্শন, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১২৭৯, পৃ. ৩৪৬-৩৪৮।

৮। দ্র. মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার ইতিহাস, ১ম ভাগ, জ্যৈষ্ঠ সম্বৎ ১৯২৮, গুপ্তযন্ত্র, কলিকাতা।

৯। দ্র. রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, প্রথম প্রকাশ ১৮৭২, বুধোদয় যন্ত্র, হুগলী।

১০। দ্র. রমেশচন্দ্র দত্ত, The Literature of Bengal, 1877, I. C. Bose & Co, Stanhope Press, Calcutta.

১১। দ্র. রাজনারায়ণ বসু, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, ১৮৭৮ সাল, বঙ্গভাষা সমালোচনা সভা, কলিকাতা।

১২। দ্র. অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, বঙ্গসাহিত্য, ভারতী, কার্তিক ১২৮৫।

১৩। দ্র. গঙ্গাচরণ সরকার, বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে বক্তৃতা, ১৮৮০, নন্দলাল বসু, সাধারণী যন্ত্র, চুঁচুড়া।

১৪। দ্র. বঙ্কিমচন্দ্র প্রদর্শিত পথ বলতে মুকুন্দ প্রশংসার ধারায় কথাটিকে বোঝানো হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র মুকুন্দের প্রশংসা করার পর থেকে তাঁর অনুগামীরা সেই পথই অনুসরণ করেছিলেন বার বার, যা পরবর্তীকালে মুকুন্দ প্রশংসার ধারা তৈরি করেছিল।

১৫। ভারতী পত্রিকায় ভাদ্র ১২৮৭ বঙ্গাব্দে লেখা 'বাঙ্গালী কবি নয়' প্রবন্ধটি লেখার মাত্র ছয় মাস আগে রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরেছেন।

১৬। প্রায় দে'ড় বৎসর ইংল্যাণ্ডে কাটিয়ে এবং হেনরি মরলির শিক্ষার প্রভাবে ইংরেজী সাহিত্য জগতে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ কবির 'জীবনস্মৃতি'র ভগ্নহৃদয় অধ্যায়ে তিনি নিজেই বলেছিলেন- 'তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্য দেবতা ছিলেন শেক্সপীয়র মিল্টন ও বায়রন। ইহাদের লেখার ভিতরকার যে জিনিষটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়বেগের প্রবলতা'।

১৭। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. বাঙ্গালী কবি নয়, ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭, পৃ. ২১৯-২২৯।

১৮। দ্র. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নীরব কবি, বান্ধব, মাঘ ১২৮১, পৃ. ১৮৫-১৮৯।

১৯। দ্র. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- বাঙ্গালী কবি কেন, বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮২, পৃ. ৩৯০-৪০৪।

২০। বাঙ্গালী কবি নয় প্রবন্ধটিতে উক্ত দুই বক্তব্যকে আক্রমণ এবং নস্যাৎ করে রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করলেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. বাঙ্গালী কবি নয়, ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭, পৃ. ২১৯-২২৯।

২১। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে নয়, নিছক সমকালীন সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়েই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদাহরণ তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

২২। সমকালীন মুকুন্দ ভক্ত বলতে মূলত বঙ্কিম গোষ্ঠীর লেখকগণকেই বোঝানো হচ্ছে।

২৩। দ্র. বাংলা শব্দতত্ত্ব, তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ ১৩৯১, প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৩২৭-৩২৮।

২৪। যে খাতাটি তিনি প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ অবলম্বনে বৈষ্ণব পদাবলীর শব্দার্থ, ব্যাকরণের বিশষত্ব, টীকা-টিপ্পনী লিখেছিলেন। খাতাটি ১৩০৩ সাল নাগাদ কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদকে ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আর তা ফেরৎ পান নি।

২৫। গ্রন্থটির হদিস আর পাওয়া যায় না।

২৬। দ্র. দেবনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দের অভয়ামঙ্গল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য সম্বলিত, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৯০।

২৭। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কাব্যি সমালোচনা, নবজীবন, ৩য় ভাগ, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১২৯৩, পৃ. ৩১৫।

২৮। দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, ১৯৭৪, পৃ. ১৭২।

২৯। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী কাব্যের বৃহদায়তন দেখে কাব্যটিকে মহাকাব্য বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই তত্ত্বকে বাতিল করে দেন।

৩০। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাঙ্গালী কবি নয়, ভারতী ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১২৮৭, পৃ. ২২৮।

৩১। দ্র. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ. ২২৮-২২৯।

৩২। দ্র. পঞ্চভূত (১৩০৪) গ্রন্থের নরনারী প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ।

৩৩। দ্র. সাহিত্য (১৩১৪) গ্রন্থের সৌন্দর্য ও সাহিত্য প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ।